শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আহমদ ছফা

BENGALIEBOOK.COM
BE
বেঙ্গলিবুক.কম
bengaliebook.com
বেঙ্গলিবুক.কম
বেঙ্গলিবুক.কম
bengaliebook.com
বেঙ্গলিবুক.কম
★2023★

সূচিপত্র

মুখবন্ধ 2
এক 4
দুই 7
তিন 12
চার 16
পাঁচ 22
ছয় 32
সাত 46
আট 55
নয় 63
দশ 70
এগার 78

মুখবন্ধ

ছাত্র থাকার সময়ে আমি ইংরেজিতে লিটারারি আইডিয়েল অব বেঙ্গল শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখি। সেই রচনাটি বাংলা একাডেমীর ইংরেজি জার্নালে প্রকাশিতও হয়েছিলো। উনিশশো আটষট্টি উনসত্তুর সালের দিকে হবে। সেই সময়েই আমার প্রবন্ধের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অংশ লিখতে গিয়ে মনে স্বতঃই কতিপয় প্রশ্ন জেগেছিলো। তারপর থেকেই বঙ্কিম সম্পর্কে আমি সচেতনভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমার প্রশ্নগুলোর বাব খুঁজতে থাকি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর লিখিত যতোগুলো গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা এবং জার্নালে প্রকাশিত রচনা আমার হাতে এসেছে, আগ্রহ সহকারে পাঠ করতে আরম্ভ করি। বঙ্কিম সম্পর্কে যে বিতর্ক দীর্ঘকাল থকে চলে আসছিলো, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারেননি। তারপর সামাঙ্কি, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রশ্নের জ্বটসমূহ যখন ক্রমবর্ধিত হারে জটিল আকার ধারণ করতে থাকে, বঙ্কিম সম্পর্কিত বিতর্কও নতুন নতুন মাত্রা অর্জন করতে থাকে। আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে বঙ্কিম সম্পর্কিত বিতর্ক যেখানে এসে থেমেছে, সেটাকে বিচার বল বোধকরি সঙ্গত হবে না। একদল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথেরও ওপরে স্থান দিতে চান, অনাপল তাঁকে একেবারে খারিজ করতে পারলে বেঁচে যান।

আমার এই রচনাটিতে বল বিতর্কসম্মাহের কে ধারাবাহিকতা তার বেশ একেবারে অনুপস্থিত সে কথা আমি বলতে পারবে না। বরঞ্চ বলতে চাই বিতর্কটা চলে আসছিলো

বলেই আমি রচনাটা লেখার দায়িত্ব স্বীকার করতে প্রলুব্ধ হয়েছি। এই রচনা আমি প্রত্যক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা মহল বিশেষের পক্ষে বা বিপক্ষে সমর্থন অসমর্থন জানানোর জন্য লিখতে প্রবৃত্ত হইনি। বিগত পঁচিশ বছর সময়ের পরিধিতে যে সকল চিন্তা আমার মনে সঞ্চিত হয়েছে, সেগুলো একটা সূত্রাকারে প্রকাশ করার জন্যই এ লেখা। অন্যান্য কাজের চাপের মধ্যে লেখার কাজটি করতে হয়েছিলো বলে মাঝে মাঝে পুনরুক্তি দেষ ঘটেছে। আমার লেখাটিকে সঠিক অর্থে গবেষণা কর্ম বলা শোভন হবে না। আগামীতে যাঁরা গবেষণা করবেন, আমি আশা করি তাঁদের সামনে এই রচনাটি কতিপয় নতুন দিক উন্মোচন করবে এবং সেটাই হবে এই রচনার সার্থকতা।

আমার ভ্রাতুস্পুত্র মুহম্মদ নূরুল আনোয়ার এবং স্নেহভাজন রতন বাঙালী রত্নেশ্বর দেবনাথ) রচনাটি কম্পিউটারে টাইপ এবং সংশোধন করার সময়ে বিস্তর কষ্ট স্বীকার করেছে। প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনীর ডঃ লেনিন আজাদ আগ্রহী হয়ে লেখাটি প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেছেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

বিনীত

আহমদ ছফা

ইহা

৭১ আজিজ সুপার মার্কেট

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

এক

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত এই রচনাটি আমার নিজের জীবনকথা দিয়ে শুরু করতে হবে। স্কুলে থাকার সময়ে আমাদের ইংরেজি গ্রামার, ট্রানসেন এবং বাংলা গদ্য পদ্য পড়ানোর শিক্ষক শিববাবুর নেক নজরে পড়ে গিয়েছিলাম। তাঁর পুরো নাম শ্রীশিবপ্রসাদ সেন। সোজা হয়ে হাঁটতেন। মাথার সবগুলো চুল পাকনা, তবে মাঝে মাঝে কালোর আভাস পাওয়া যেতো। শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই কাঁধের ওপর একটা ভাজ করা সুতীর চাদর ঝুলিয়ে রাখতেন। সামনের দিকের দুটো ছাড়া সবগুলো দাঁত পড়ে গিয়েছিলো। দেখলে মনে হতো ঈষৎ লালচে দাঁত দুটো চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

শিববাবুর সম্পর্কে নানা রকম কাহিনী চালু ছিলো। সেগুলো একেকটা একেক রকম। আমার ত্রিশ বছর আগে যাঁরা এই স্কুলে পড়েছেন, তাঁদের কাছে শুনেছি, তাঁরাও ছাত্র থাকার সময়ে শিববাবুকে এই একই রকম কাঁচা পাকা দেখতে পেয়েছিলেন। এখন। সাদার আভাস বেশি, তখন কাঁচার প্রতাপ ছিলো অধিক। এটুকু ছাড়া আদলে অবয়বে শিববাবুর মধ্যে উল্লেখ করার মতো কোনো পরিবর্তন খুঁজে পেতেন না। এই রকম মানুষের বয়স কত হবে জানতে চাওয়া অবান্তর। যাঁদের সম্পর্কে বলা যায়- বয়সের কোনো গাছ পাথর নেই, সত্যিকার অর্থে শিববাবু ছিলেন সে ধরনের মানুষ।

শিববাবুর বিরাগভাজন অথবা প্রিয় হওয়া কোনোটাই ক্লাশের ছাত্রদের কাছে সুখকর ব্যাপার ছিলো না। যে সমস্ত ছাত্র টেন্স, ভার্ব এবং ইংলিশ শব্দের বানান উচ্চারণ

ঠিকমতো করতে পারতো না, তাদের লিকলিকে বেত দিয়ে হাতের সুখ মিটিয়ে তিনি পেটাতেন। আর অঘা মার্কা ছাত্রদের হাই বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সমস্ত ক্লাশের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত করতেন। শিববাবু এদের বলতেন ইণ্ডিয়া কোম্পানির পিলার। যে সমস্ত ছাত্র শিববাবুর প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারতো, তাদের জন্যও ভিন্ন রকমের শাস্তি অপেক্ষা করে থাকতো। শিববাবু তাদের কানের গোড়া আস্তে আস্তে মলে দিতেন এবং আদর করে সম্বোধন করতেন শ্যালক। আমার মুখস্ত করার অনেক ক্ষমতা ছিলো। সুতরাং অনায়াসে শিববাবুর শ্যালক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হতে পেরেছিলাম। শিববাবুর শ্যালক হওয়া যেমন তেমন ব্যাপার ছিলো না। তাঁর দাবির পরিমাণ ছিলো অসম্ভব রকম চড়া। মেটাতে গিয়ে জান কাবার হওয়ার দশা।

শিববাবু আমার কাছে স্কুল লাইব্রেরির সমস্ত চাবি গছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যদি হারাস এক কিলে আস্ত মাথা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেবো। আমার এই নতুন দায়িত্ব প্রাপ্তিতে সতীর্থ ছাত্ররা ঈর্ষা করতো। কিন্তু আমাকে মস্তকটা স্কন্ধদেশের ওপর খাড়া রাখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতে হতো। চাবি রক্ষক পদ গৌরবের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আমার নাকের পানি চোখের পানি এক হওয়ার জোগাড়। শিববাবু স্কুল লাইব্রেরির আলমারির গহ্বর থেকে মোটা মোটা শক্ত মলাটের বই বের করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলতেন, পনেরো দিনের মধ্যে সবটা পড়ে ফেলবি। নইলে কিলিয়ে হাড্ডি গুড়ো করে ফেলবো। এই শক্ত মলাটের বইগুলোর কোনোটা ছিলো মাইকেল মধুসূদন দত্তের, কোনোটা নবীনচন্দ্র সেনের, কোনোটা হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী। ওই এতোটুকু বয়সে আমাকে কায়কোবাদের মহাশ্মশান, অশুমালা, অমিয়ধারা,

শিবমঙ্গল এই সকল কাব্যগ্রন্থে দাঁত বসাতে হয়েছিলো। ভূদেব। মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত এরকম কতো লেখকের বই যে আমাকে চাবি রক্ষকের পদগৌরবের ইজ্জত রক্ষার জন্য পাঠ করতে হয়েছিলো, তার অনেকগুলোর নামও এখন উলেখ করতে পারবো না। এই সমস্ত অপাচ্য এবং দুম্পাচ্য জিনিশ ভক্ষণ করার কারণে আমার মানসিক হজম শক্তির প্রক্রিয়া গড়বড় হয়ে পড়েছিলো এবং আমি এক রকম এচড়ে পেকে গিয়েছিলাম। এই সমস্ত মহাজনের মহত প্রভাবে আমার মনের বায়ুমণ্ডল এতোটা কুপিত হয়ে উঠেছিলো, একান্ত সরল প্রশ্নের সরল জবাবও আমার পক্ষে এক রকম দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিলো। অনেক লৰা কাহিনী। সে সমস্ত কথা থাকুক।

এক সময় শিববাবু বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এইবার পড়বি সাহিত্য সম্রাটের রচনা। বঙ্কিম রচনাবলী পাঠ করতে গিয়ে আমি যে প্রাথমিক হোঁচটটি খাই সেই অভিজ্ঞতার বয়ানটুকু দিয়ে আমার বঙ্কিমচন্দ্রের পুনঃমূল্যায়ন সম্পর্কিত রচনাটির সূত্রপাত ঘটাচ্ছি।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সীতারাম, রাজসিংহ, দেবী চৌধুরানী, আনন্দমঠ এই সকল উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে আমি একটা অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। এই সকল উপন্যাসের যে সকল জায়গায় মুসলমান সম্পর্কে লেখক নিষ্ঠুর এবং অকরুণ মন্তব্য করেছেন, সে সমস্ত জায়গায় পুস্তকের মার্জিনে শালা বঙ্কিম, মালাউন বঙ্কিম এবং ছাপার অক্ষরে প্রকাশের অযোগ্য এমন সব গালাগাল লিখে রেখেছে, দেখে আমার কান গরম হয়ে গেলো। এই জিনিশটি সেই বয়সেও আমাকে ভীষণ রকম ধাক্কা দিয়েছিলো।

বাংলাদেশের যে অঞ্চলটিতে আমার জন্ম, সেখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনো রকম তিক্ততা ছিলো না। যে কারণে হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে ঝগড়া বিবাদ মনোমালিন্য ঘটে থাকে, একই কারণে হিন্দুতে মুসলমানেও বিরোধ ঘটতো। বোধকরি তার একটা বড়ো কারণ এই যে আমাদের অঞ্চলে হিন্দু কিংবা মুসলমান কোনো বড়ো জমিদারের অস্তিত্ব ছিলো না। পরিবেশের প্রভাবে মুসলমান ছাত্ররা। বঙ্কিমের বইয়ের মার্জিনে এতো সমস্ত খারাপ কথা লিখে রেখেছে একথাও আমার মন বিশ্বাস করতে চায়নি। নিজেকেই আমি বার বার জিগগেস করেছি, কোনো রকমের। উষ্কানি ছাড়াই মুসলমান ছাত্ররা এতোসব অশ্লীল মন্তব্য লিখে রাখলো কেনো? আমার বয়স যতো বেড়েছে, এই ব্যাপারটি নানান দৃষ্টিকোণ থেকে বারংবার খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি। সহজাত সাম্প্রদায়িক অনুভূতির প্রকাশ ঘটাবার জন্যই শুধু আমাদের স্কুলের ছাত্ররা বঙ্কিমের ওপর মানসিক প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে বাপান্ত করতে প্রবৃত্ত হয়েছে,

এই জিনিশটি আমি পুরো সত্য বলে মেনে নিতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিলো আরো একটা বড়ো কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে। আমি দুর্বল মস্তিষ্কের। কারণে সেটা খুঁজে বের করতে পারছিনে। স্কুল থেকে সরাসরি ক্লাশ টপকে টপকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিনি। মাঝখানে অনেকগুলি বছর অন্য কাজে ব্যয় করতে হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়ে বঙ্কিম সাহিত্য পড়তে গিয়ে আমাকে স্কুলের মতো একই রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হলো। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি থেকে বঙ্কিমের লেখা বইগুলো ধার করে এনে পড়তে গিয়ে দেখি মার্জিনে একই ধরনের মন্তব্য লিখে রাখা হয়েছে, তবে তফাৎ একটা অবশ্যই আছে। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা যে সকল কথা লিখেছিলো সেগুলো অশ্লীল, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মন্তব্যগুলো অশোভন। যদিও এই জিনিশটি আমাকে একটা ভীষণ রকম নাড়া দিয়েছিলো, এ নিয়ে আমি কারো সঙ্গে মতামত বিনিময় করিনি। বছর তিনেক আগে উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি রচনা পাঠ করার পর আমার চমক ভাঙ্গে। শরশ্চন্দ্র মুসলমান ছাত্রদের সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে জোড়হাত করে একটি আবেদন রাখছেন। বাবারা বঙ্কিমের বইয়ের পাতায় তোমরা যেভাবে 'শালা বঙ্কিম' ওজাতীয় কথা লিখে রাখো, দোহাই বাবারা আমার বইতে সে রকম কিছু যেনো না লিখো, কথাগুলো অবশ্য আমার নিজের জবানিতেই বললাম। তারপর থেকে আমার মনে একটা ধারণা গাঢ়মূল হয়েছে যে মুসলমান ছাত্ররা বঙ্কিমের বিশেষ বিশেষ বই পাঠ করা মাত্রই স্বতঃস্ফুর্ত আবেগে আজে বাজে কথা লিখে রাখে। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। বিষয়টা গোপন একটা ব্যাধির মতো নীরবে এমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিলো, শরশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন সহৃদয় কথা সাহিত্যিকেরও দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। স্কুল,

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিক্রিয়ার কথা শুধু বয়ান করলাম। বয়স্ক মুসলমান পাঠকদের মর্মে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল রচনা কি রকম অক্রোশের জন্ম দিয়েছিলো, এই রচনায় একটা পর্যায়ে সেটা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হবে।

কথা হলো, মুসলমান ছাত্রদের একটা অংশ বঙ্কিমের বইয়ের পাতায় অশোভন মন্তব্য লিখে রাখে কেনো? বঙ্কিম সাম্প্রদায়িক লেখক সেটাই কি তার একমাত্র কারণ? তিনি যদি সাম্প্রদায়িক লেখক হয়েও থাকেন, তার মাত্রা এবং ধরনটা কি রকম। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করে সাহিত্য রচনা করা হলে, সেটা অপর সম্প্রদায়ের মানুষের গাত্র দাহের কারণ হবে, সেটাও সমর্থনযোগ্য ব্যাপার হতে পারে না। মাইকেল এবং বিদ্যাসাগর ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর ঘোট বড়ো লেখকের বেশিরভাগই ছিলেন সাম্প্রদায়িক। এই অর্থে সাম্প্রদায়িক যে উনবিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতটাই ছিলো হিন্দু ধর্ম এবং সমাজ কেন্দ্রিক। মুসলিম সমাজের উপস্থিতি সেখানে একবারেই ক্ষীণ, নেই বললেই চলে। এই পরিপ্রেক্ষিতের বলয় থেকে সে। সকল চিন্তা ভাবনা বিকশিত হয়ে গতিশীলতা অর্জন করেছে, তার সবগুলো নঞর্থক ধরে নিয়ে নাকচ করারও উপায় নেই। যদি তাই হয় বাঙালি জাতির মনন এবং চিন্তা চর্চার বিকাশের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তরকেই অস্বীকার করা হয়। অতীতের প্রতি অবিচার করে কেউ কখনো সুস্থ ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না।

বঙ্কিম ছাড়া আরো অনেক সাম্প্রদায়িক লেখকের রচনা আমি পাঠ করেছি। তাঁদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। যেহেতু হিন্দুদের মধ্যে লেখালেখির চলটা বেশি ছিলো, তাই